আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রশ্নাতীত আনুগত্য ঈমানের এক অলঙ্ঘনীয় শর্ত

﴿ طاعة الله وطاعة رسوله من شروط الإيمان ﴾

[বাংলা - bengali - البنغالية]

লিয়াকত আলী আব্দুস সবুর

সম্পাদনা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

2010 - 1431

IslamHouse

﴿ طاعة الله وطاعة رسوله من شروط الإيمان ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ لياقت علي عبد الصبور

مراجعة: إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

IslamHouse

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রশ্নাতীত আনুগত্য ঈমানের এক অলঙ্ঘনীয় শর্ত

আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য দর্শন বা যুক্তিবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ বুদ্ধি-বিবেচনা, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানুষ এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান লাভ করতে পারে না। এ বিষয়গুলো অতিপ্রাকৃত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাই একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বর্ণনাই এ ব্যাপারে প্রথম ও শেষ মাধ্যম।

আল্লাহর বাণী বা আসমানী কিতাবসমূহ এবং তার বাহক বা আম্বিয়ায়ে কিরামের বক্তব্যের আলোকেই অতি প্রাকৃত বিষয়গুলোর সিদ্ধান্ত হতে পারে। অন্য কোন উপায়ে নয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, কয়েক হাজার বছর ধরে দার্শনিকগণ এই অর্থহীন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছেন এবং নিজেদের মেধা, প্রতিভা ও চিন্তাশক্তিকে ব্যয় করেছেন। অথচ কোন বিষয়ের প্রাথমিক সূত্র ও উপাত্তজ্ঞান না থাকলে নিছক বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করে সে বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা যায় না। দার্শনিকরাও স্বীকার করেন স্রষ্টার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন মাধমে তাঁদের নাগালের বাইরে। তা সত্ত্বেও দার্শনিকরা স্বাচ্ছন্দ্যে এই নাযুক বিষয়টির অবাধ চুলচেরা বিশ্লেষণ ও খুঁটিনাটি আলোচনায় নাক গলিয়েছেন। চিন্তা জগতে গ্রীক দর্শনের আগ্রাসন রোধ করার জন্য মুসলমানদের মধ্যে আবির্ভূত হন মুতাকাল্লিম শ্রেণী। কিন্তু তারাও দর্শনের মূলনীতি ও পরিভাষাগুলো মেনে নেন। তারাও আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে লিপ্ত হন। অথচ তাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল দার্শনিকদের চিন্তাধারার গলদ চিহ্নিত করা। গণিত শাস্ত্র ও প্রকৃতি বিজ্ঞানই দার্শনিকদের আলোচনা ও গবেষণার বিষয়। মুতাকাল্লিমদের কর্তব্য ছিল, দার্শনিকদের তাদের কর্মক্ষেত্র স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে তারা যেন অনর্থক মাথা না ঘামান সে জন্য তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া।

দুঃখের বিষয়, মুতাকাল্লিমগণ এ দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করতে পারেননি। ফলে, ইসলামের অবক্ষয়ের যুগে মানুষের ধ্যান-ধারণা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, আল্লাহর অস্তিত্ব, জগতের নশ্বরতা, মৃত্যু পরবর্তী জীবন ইত্যাদি আকীদা বা বিশ্বাসের যথার্থতা প্রমাণের জন্য দর্শনভিত্তিক যুক্তি প্রমাণকেই মাপকাঠিরূপে মনে করা হতো। মুতাকাল্লিমরাই এই ধারণা সৃষ্টির পেছনে অনেকাংশে দায়ী ছিল। মুহাদ্দিস ও ফকীহদের ক্ষুদ্র দল দু'টি ব্যতীত অধিকাংশ মুসলমান কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে মুকাতাল্লিমদের রচনাবলীকেই তারা আহকাম ও আকায়েদের উৎসরূপে গ্রহণ করেছিল। ইসলামী শরীয়ত যে দর্শন বিরোধী নয়–তা প্রমাণ করার জন্য তারা আয়াত ও হাদীসের দর্শনোপযোগী ব্যাখ্যার প্রয়াস পেত। অথচ তাদের উচিত ছিল কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিজেদের চিন্তাধারাকে সংশোধন করে নেয়া। তা না করে তারা আয়াত ও হাদীসকেই দর্শনের উপযোগী করার চেষ্টা করতেন। এই অদ্ভুত মানসিকতা সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন– নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর তাদের এত অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস যে, বুদ্ধি যা অনুমোদন করে তারা সেটিকেই মূল হিসাবে ধরে নিয়ে নবীদের শিক্ষা ও বক্তব্যকে তার অনুগত করে নেয় এবং নিজেদের নির্ধারিত নিয়ম ও স্বীকৃত নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকুই তারা গ্রহণ করে। আর যা তাদের পূর্বানুমানের সাথে সাংঘর্ষিক তা তারা নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করে।

সাধারণ মানুষের বিশ্বাস জমে গেল, কালাম শাস্ত্রের মূলনীতিই সত্যের মাপকাঠি। কিন্তু এ বিশ্বাস থেকে তাদের মানস জগতে এক বিরাট দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হতো। মনে প্রশ্ন জাগত–এগুলো যদি প্রকৃত জ্ঞান হয়, তাহলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের উক্তিতে এগুলোর কোন হদিস পাওয়া যায় না কেন? দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের উপর যাদের পূর্ণ আস্থা ছিল বা দর্শনের প্রভাবে যাদের মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন ছিল তারা কখনো কখনো সরাসরি আবার কখনো পরোক্ষভাবে বলে দিত তখন ছিল ইসলামের শৈশবকাল। তাই এসব তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে তখনকার সাদাসিধে নিরীহ ব্যক্তিরা কোন ধারণা রাখতেন না। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে দর্শনের উপর আস্থার পাশাপাশি সাহাবায়ে কিরামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল তারা পড়ত মহাবিপাকে। কোন সন্তোষজকন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো তাদের পক্ষে সম্ভব হতো

না। তাদের মনে এ খটকা লেগেই থাকত যে, দীনের এ মৌলিক বিষয়গুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাখ্যা করে গেলেন না কেন?

আগেই বলা হয়েছে, মানুষের এই বিভ্রান্তির পেছনে দার্শনিক ও মুতাকাল্লিম শ্রেণীর কর্মকাণ্ডই দায়ী ছিল। দীর্ঘদিন ধরে এ দু'শ্রেণী মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির এমন মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর আলোচনায় বুদ্ধিবৃত্তির ভূমিকাকে এমন বড় করে দেখিয়েছে যাতে মনে হয়, এক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিই হচ্ছে চূড়ান্ত মাপকাঠি। ফলে, আহকাম ও আকাইদ উভয় ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তি সকল সিদ্ধান্তের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচ্য হতে লাগল।

প্রায় ছয়শত বছর যাবত এই ভুলকে সংশোধনের জন্য মুসলিম মনীষীদের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। এমনকি ইমাম গায্যালী রহ. দর্শনের সমালোচনা করে গ্রন্থ রচনা করলেও বুদ্ধিবৃত্তির একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে জোরালো কোন বক্তব্য পেশ করেননি। এ বিষয়ে যিনি পূর্ণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি হলেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া। তিনি এ সত্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন যে, ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানই আকাইদের মূল উৎস। কোন মৌল বিশ্বাস প্রমাণের জন্য বুদ্ধিবৃত্তি সহায়ক হতে পারে, মাপকাঠি হতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তি শুধুমাত্র রাসূলের সত্যতার স্বীকৃতি দান করতে পারে। অতঃপর রাসূলের উপস্থাপিত যাবতীয় বিষয় বিশ্বাস ও পালন করার জন্য ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

রিসালতের সত্যতা প্রমাণের পর বুদ্ধিবৃত্তির কর্তব্য হলো রাসূলের প্রতি আস্থা রেখে তার নিরংকুশ আনুগত্য করে যাওয়া। কোন ব্যক্তি যখন জানতে পারবে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল, তখন তাঁর নিকট থেকে যা কিছু নির্দেশ বা উপদেশ পাওয়া যাবে তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। এক্ষেত্রে যদি বুদ্ধিবৃত্তি তার সাথে বিরোধিতা করে অর্থাৎ রাসূলের বিবৃতির সাথে বুদ্ধিবৃত্তির সিদ্ধান্তের যদি গড়মিল হয়, তাহলে বুদ্ধিবৃত্তির সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। যেমন– কারো অসুখ হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয়। চিকিৎসক যে ব্যবস্থাপত্র দেন, তা মনে না চাইলেও মেনে নিতে হয়। কারণ, এক্ষেত্রে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে যে, চিকিৎসক এ রোগ সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখেন। তেমনি নবী-রাসূলগণ যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি জ্ঞান লাভ করেন। তাই তাদের জানার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। মৌল বিশ্বাস সম্পর্কে তাদের মাধ্যমে যে বিবৃতি পাওয়া যায় সেটিই হবে চূড়ান্ত সত্য। বুদ্ধিবৃত্তিক মাধ্যমে এক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। হয়ত কখনো কখনো তাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু ওহীর মাধ্যমে যা পাওয়া যাবে বুদ্ধিবৃত্তি তার সাথে একমত না হলেও সেটিকেই সঠিক মনে করতে হবে এবং বুদ্ধিবৃত্তির সিদ্ধান্তকে বাদ দিতে হবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর প্রতি নিঃশর্ত ঈমান আনা অপরিহার্য। নবুওয়াত ও রিসালাতের দাবী হল কোন প্রকার যুক্তি-তর্কের তোয়াক্কা না করে সকল প্রকার দ্বিধা-সংকোচ উপেক্ষা করে রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এরই নাম ঈমান। শর্তযুক্ত বিশ্বাসকে শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে গণ্য করার কোন উপায় নেই। যদি কেউ বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর বক্তব্যসমূহকে আমি তখনই মেনে নেব, যখন তার বিপরীতে কোন যুক্তি থাকবে না–তাহলে সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি। শর্তহীনতাই যে ঈমানের জন্য অপরিহার্য তা সকলের জেনে রাখা দরকার।

ইসলাম অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর প্রতি মানুষকে অবশ্যই এমন নির্দ্বিধায় ঈমান আনতে হবে যাতে কোন শর্ত যোগ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর দেয়া প্রতিটি সংবাদকেই সত্য বলে মেনে নিতে হবে এবং তাঁর প্রতিটি নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কোন ব্যক্তি যদি এর বিপরীত করে অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি বক্তব্যকে যুক্তির নিরিখে বিচার করতে চায় এবং বুদ্ধিবৃত্তির সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে তা হবে ঈমানের পরিপন্থী। বুদ্ধি ও যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করে সন্তোষজনক ফল না পেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যকে বিশ্বাস করা যাবে না– এমন

মানসিকতা কুফরীরই নামান্তর। কেননা, যুক্তির কোন স্থায়ী রূপ নেই। মানবীয় বুদ্ধি ও যুক্তি হচ্ছে তাসের ঘর। মানুষ নিছক অজ্ঞতার কারণে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার আকর্ষণীয় পরিভাষা দেখে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। কিন্তু গভীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে– এগুলোর সারবত্তা বলতে কিছুই নেই।

তাই বলে যুক্তি ও বুদ্ধির কোন গুরুত্ব নেই এমন নয়। বুদ্ধিবৃত্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে উপকার গ্রহণের প্রতি কুরআন মজীদ মানুষকে বারবার উদ্বুদ্ধ করেছে। বিশুদ্ধ যুক্তির সাথে আম্বিয়ায়ে কিরামের শিক্ষার কোন বিধানকে অসঙ্গত বলে রায় দেয় না। প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সাথে বিচার করলে বুদ্ধিবৃত্তির এই ইতিবাচক ভূমিকাই আমাদের কাছে ধরা পড়বে। বিশুদ্ধ ও সুপ্রমাণিত জ্ঞান আল্লাহর রাসূলপ্রদত্ত সংবাদের প্রতিকূল নয়, বরং অনুকূল বিশুদ্ধ যুক্তি কখনই শরীয়তের বিধানের পরিপন্থী হয় না। বস্তুত আল্লাহর রাসূল এমন কোন সংবাদ তার উম্মতের নিকট দিয়ে যাননি, সুস্থ বিবেক যা অস্বীকার করতে পারে। তবে তিনি এমন অনেক সংবাদ দিয়ে গেছেন যার স্বরূপ উপলব্ধি করা বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ লাভের চেষ্টা করা মানুষের জন্য উচিত নয়। যুক্তিসঙ্গত হোক বা যুক্তির অতীত হোক, রাসূলের সকল সংবাদকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়াই মানুষের কর্তব্য। রাসূলের নিরঙ্কুশ আনুগত্যই ঈমানের জন্য অপরিহার্য।

সমাপ্ত